আমরা ও বিশ্বজগৎ

বালকবালিকাগণের জন্য সরল ভাষায় লিখিত

তিনখানি চিত্র সম্বলিত

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
[illegible] কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা ৬

আট আনা

PREFACE

Sometime ago I happened to come across a copy of the book named "Our World and Us". The book is written by Mr. Adam Gowans Whyte B. Sc. It is a brightly interesting book "written for children who are beginning to wonder how the wheels go round, but will also serve to awaken the interest of older readers in the romantic story which modern science has to tell about men, matter and the multitude of stars". On perusal of the book I learnt many things which in spite of my occasional study of scientfic books I was ashamed that I did not know even at an advanced age of 74. This tempted me to write a similar book in Bengali so that it may be placed in the hands of grown up children specially at a time when the University of Calcutta has chosen to declare that the matriculation examination in all subjects except English should be in the varnacular of the province. I have written the book following somewhat the arrangement of chapters in Mr. Whytes' book and with the permission of the publishers, to whom I am much indebted for their courtesy, I have borrowed certain portions from the book.

I have learnt in course of my conversation with many of my educated country men who hold high posts in Government service or are engaged in professional callings

or politics that they are as much ignorant as I was of the revelation of modern science in respect of things going round them. I would advise them to procure copies of Mr. Whytes' two of the admirable and popular works, namely, "Our World and Us" 1s. 6d. and the "Wonder World" 2s. 6d. published by Messrs. Watts and Co., Johnson's Court, Fleet Street, London, and I am sure they will find them worth perusal.

AKSHAY LODGE
112 *Amherst Street.*
Calcutta.

সূচিপত্র

আমরা ও বিশ্বজগৎ

আমরা ও বিশ্বজগৎ

প্রথম অধ্যায়

আমাদের দেহ কোন্ কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত ?

তোমাদের কি ইচ্ছা হয়না তোমাদের এই শরীরটা কোন্ কোন্ পদার্থ দিয়া তৈয়ারী জান্‌তে ? তোমাদের সামনে যে বাড়ীটা দেখিতেছ ঐ বাড়ীটা কে তৈয়ারী করেছে জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা বলিবে মিস্ত্রি করিয়াছে। মিস্ত্রি কি করিয়া বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তোমাদের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি কম তাহারা বলিবে তা'তো জানিনা ; কিন্তু যারা বুদ্ধিমান ও লেখাপড়া শিখিতেছে তাহা বলিবে ইঁট, কাঠ, চূণ, সুরকী, বালি এই সব দিয়া তৈয়ারী করিয়াছে। আবার যারা বেশী লেখাপড়া শিখিয়াছেন ও বিদ্বান হইয়াছেন তাঁহারা ঐ ইঁট কেমন করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে, কাঠ কোথা হইতে আনা হইয়াছে, কি রকম করিয়া কাটা হইয়াছে, চূণ কেমন করিয়া তৈয়ারী করিতে হয় এই সমস্ত বলিয়া দিবেন। তোমাদের শরীরটা কি দিয়া তৈয়ারী হইয়াছে বলিলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই বলিবে তাহা জানি না তবে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা মা বাবার কাছে শুনিয়াছি।

বাড়ী সম্বন্ধে যেমন মিস্ত্রি তৈয়ার করিয়াছে জানিলে যথেষ্ট হয় না, তোমাদের শরীর সম্বন্ধে সেইরূপ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন এই মাত্র জানিলে যথেষ্ট হয় না। তিনি কেমন করিয়া ও কি কি পদার্থ দিয়া তৈয়ারী

করিয়াছেন তাহাও জানিতে হয়, নচেৎ চিরকালই নির্ব্বোধের মত হইয়া থাকিবে। জগতের অন্যান্য যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন কেবলমাত্র ইহা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে।

একটা যাহা কিছু তোমাদের দেখাইলে তোমরা বলিবে সেটা চেতন, অচেতন কি উদ্ভিদ্। পৃথিবীর সকল জিনিসই এই তিনের মধ্যে একটা। তোমরা বড় হইয়া লেখাপড়া শিখিয়া তোমাদের জ্ঞান যখন অনেকটা উন্নত হইবে তখন বুঝিতে পারিবে যে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। বৃক্ষাদি মাটী হইতে যে সকল রস ও খাদ্য খাইয়া বড় হয় এবং মানুষ দুধ, ভাত, রুটী, তরকারী, জল প্রভৃতি খাইয়া যে বড় হয় তাহা সমস্তই অচেতন পদার্থ। এই সকল অচেতন পদার্থই তোমার শরীরের গঠন ও পুষ্টি সাধন করিয়াছে। মাটী জল প্রভৃতি অচেতন পদার্থ হইতে উদ্ভিদের দেহের গঠন ও বৃদ্ধি হয় আবার উদ্ভিদ হইতে মানুষের দেহের গঠন ও বৃদ্ধি হয়। যে দুধ আমরা খাইয়া মানুষ হই তাহাতে আমাদের শরীরের গঠন ও বৃদ্ধির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা সমস্তই আছে। আমরা গরুর দুধ খাইয়া বাড়িয়া থাকি গরু আবার ঘাস খাইয়া বড় হয়, ঘাস আবার মাটী জল প্রভৃতি খনিজ পদার্থ খাইয়া বড় হয়। আমরা যদি গরুর দুধ খাইতে না পাই, গরু যদি ঘাস খাইতে না পায়, ঘাস আবার যদি মাটী হইতে তাহার খাদ্য না পায়, তাহা হইলে কেহই বাঁচিতে পারে না। সোনা, রূপা, লোহা যেমন খনিজ পদার্থ মাটীও একপ্রকার খনিজ পদার্থ, খনিজ পদার্থ মাত্রেই অচেতন। সুতরাং জানা গেল যে অচেতন খনিজ পদার্থই সকলের মূল।

যদি জিজ্ঞাসা কর ঐ খনিজ পদার্থের মূল কি? আমি বলিব সূর্য্য। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ না পাইলে খনিজ পদার্থ সকলের গঠন হইত না। অচেতন খনিজ পদার্থই যখন সকলের গোড়া তখন উহাদের গঠন

না হইলে জগতের কোনও পদার্থেরই উৎপত্তি হইত না। জল, বায়ু, মাটী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, আমাদের শরীরের রক্ত, মাংস, হাড়, মস্তিষ্ক, গাছের সার, ছাল, পাতা প্রভৃতি জগতের যাহা কিছু সমস্তই খনিজ পদার্থ হইতে উৎপন্ন। আমরা রসায়ন-বিদ্যার সাহায্যে কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থ জগতে আছে তাহাদের বিষয় জানিতে পারিয়াছি এবং তাহাদের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি,—উহাদের সংখ্যা বিরানব্বইটী। আমরা পদার্থ সকল বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা কোন্ কোন্ মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বলিতে পারি। যেমন জলকে বিশ্লেষণ করিয়া জানিতে পারি অম্লজান (Oxygen) ও জলজান (Hydrogen) নামক দুইটী মূল পদার্থের রাসায়নিক (Chemical) মিশ্রণে জলের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্রব্যাদির মিশ্রণ দুই প্রকার হয়, একটী রাসায়নিক ও অপরটী সাধারণ। যদি খড়ি গুড়ার সঙ্গে হলুদের গুড়া মিলাইয়া দাও তাহা হইলে উহাদের যে মিশ্রণ হইবে উহাকে সাধারণ মিশ্রণ বলে। ইহাতে খড়ির সূক্ষ্ম অংশ সকল ও হলুদের সূক্ষ্ম অংশ সকল পাশাপাশি থাকিয়া যায়। খড়ি গুঁড়ার রং সাদা ও হলুদ গুড়ার রং হল্‌দে এই উভয় রং মিশাইয়া ফিকা হল্‌দে হয়। আর যদি চুণ ও হলুদ মিশাইয়া দাও উহাদের যে মিশ্রণ হইবে তাহার নাম রাসায়নিক মিশ্রণ। চুণের রং সাদা ও হলুদের রং হল্‌দে ; কিন্তু ইহাদের মিশ্রনে ফিকা হলদে রং না হইয়া ঘোর লালবর্ণ একটী পৃথক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। অম্লজান ও যবক্ষার-জান বাষ্পের মিলনে বায়ুর উৎপত্তি হয়। ইহা সাধারণ মিশ্রণ; কিন্তু অম্লজান ও জলজান বাষ্পের মিশ্রণে যে জলের উৎপত্তি হয় তাহা রাসায়নিক মিশ্রণ। যাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যায় পণ্ডিত তাঁহারা মানুষের দেহস্থ পদার্থ সকল বিশ্লেষণ করিয়া জানিয়াছেন যে তাহা প্রধানতঃ অঙ্গার, অম্লজান, জলজান, যবক্ষারজান, ফস্ফরস্ এবং গন্ধক এই মূল পদার্থ সকল দ্বারা

নির্ম্মিত। ইহা ছাড়া তাহাতে সোডিয়ম্, ক্লোরিণ, পটাসিয়াম্ ফ্লু্রিন, লৌহ, ম্যাগ্নিসিয়ম্, আইওডিন, লিথিয়ম্, সিলিকন ও ক্যালসিয়ম্ নামক মূল পদার্থ সকল অল্প পরিমাণে আছে, এবং সীস্, তাম্র ও মাঙ্গানিস্ ধাতুর অস্তিত্ব সামান্য পরিমাণে দেখা যায়। উপরে যে সকল পদার্থের নাম করিলাম তাহারা সবগুলিই মূল পদার্থ। একটা দেশ্লাই কাটীতে অঙ্গার, বিস্ফোরক, গন্ধক, অম্লজান, জলজান, ও যবক্ষারজান এই কয়েকটী মূল পদার্থ থাকে। একটা মানুষের শরীরের প্রধান উপাদান প্রায় ঐ কয়েকটী, বেশীর ভাগ খানিকটা জল আছে, সুতরাং মানুষকে একটী দেশ্লাইএর কাঠি বলিলেও হয়। দেশ্লাইয়ের কাঠির মাথা ঘসিয়া দিলেই তাহার ভিতরকার লুকান শক্তি প্রকাশিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে, মানুষের মাথা ঘষিয়া দিলে অর্থাৎ তাহার মস্তিষ্কের চালনা করিলে মানুষের মধ্যে যে লুকান শক্তি সকল আছে তাহা প্রকাশ পায় এবং মানুষকে অদ্ভুত কর্ম্মী করিয়া দেয়। সে তাহার দেহ কোন্ কোন্ মূল পদার্থ দিয়া তৈয়ারি তাহা বলিতে পারে, সে কোটী বৎসর পূর্ব্বে কি ছিল তাহা জানিতে পারিয়াছে। এই পৃথিবী যাহার উপর সে বাস করে তাহা কত বড় ও তাহার ওজন কত তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকল পৃথিবী হইতে কতদূরে এবং তাহারা কত বড় তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। উহারা কি করিয়া উৎপন্ন হইল এবং অনন্ত আকাশে কি ভাবে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে তাহাও বলিতে পারে। সে নদী, খাল, পুল, রেল্পথ, নগর, সহর প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর উপরকার আকারের পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। বিদ্যুৎকে ধরিয়া তাহার নিজের কাজে লাগাইয়াছে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হাজার মাইল দূরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে, ছবিকে কথা কওয়াইতেছে, সুমিষ্ট গীতবাদ্য করিতেছে ও ভাল ভাল পুস্তক লিখিতেছে। সে না করিতে

পারে এমন কাজই নাই, তাই তাহাকে অদ্ভুত কর্ম্মী বলিয়াছি। এমন যে মানুষ তাহার শরীরটা কোন্ কোন্ মূল পদার্থে তৈয়ারী তাহা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। পরের অধ্যায়ে আমি মূল পদার্থ সকলের উৎপত্তি, প্রকার ও গঠনের কথা বলিব। এখন আমরা জানিলাম যে,—

জগতে যাহা কিছু আছে তাহাদিগকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি, যথা—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ।

চেতন পদার্থ সকল উদ্ভিদ খাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; উদ্ভিদ সকল আবার অচেতন পদার্থ খাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অচেতন পদার্থ হইতেই চেতন পদার্থ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা চেতন পদার্থ হইলেও আদিতে অচেতন পদার্থ হইতেই আমাদের এই দেহের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমাদের শরীরের তিন ভাগের দুই ভাগ জলে পরিপূর্ণ। আমাদের শরীরের সমুদয় অংশ যথা হাত, পা, রক্ত, মাংস প্রভৃতি উপরোক্ত বিরানব্বই মূল পদার্থের মধ্যে প্রধানত অঙ্গারক, অম্লজান, জলজান ফসফরস্ প্রভৃতি উনিশটী মূল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থ মাত্রেরই প্রাণ আছে

পূর্ব্বে যে বিরানব্বইটী মূল পদার্থের কথা বলিয়াছি তাহা হইতেই জগতের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পৃথিবীতে জল, বায়ু, মাটি, পাথর, গাছ, পালা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সমস্তই ঐ বিরানব্বইটি মূল পদার্থের বিভিন্ন প্রকার মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ জগতের পদার্থ সকল বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া উহা নিশ্চয়রূপে জানিয়াছেন। যে রকম উপায়ে জানিয়াছেন তাহা সামান্য একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। জল একটা সাধারণ পদার্থ। খানিকটা জল লইয়া একটা মোটা কাঁচের বোতলে পুরিয়া তাহার মুখ এমন করিয়া বন্ধ কর যে তাহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। ঐ জলের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ (Electric currrent) প্রবেশ করাইয়া দিবামাত্র দেখিতে পাইবে জলটা বাষ্পে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ঐ বাষ্প পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবে উহাতে এক ভাগ অম্লজান ও দুই ভাগ জলজান বাষ্প আছে। আবার যদি এইরূপ একটা বোতলে দুই ভাগ জলজান এক ভাগ অম্লজান বাষ্প পুরিয়া তাহার ভিতর বিদ্যুতের স্রোত চালাইয়া আগুনের ফিন্‌কি বাহির করিয়া দাও তাহা হইলে দেখিবে বোতলের ভিতর বাষ্পের পরিবর্ত্তে খানিকটা জল রহিয়াছে। ইহাতে নিশ্চয়রূপে জানা গেল যে দুই ভাগ জলজান ও এক ভাগ অম্লজান মূল পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণে জলের উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং জলকে বিশ্লেষণ করায় ঐ দুইটী মূল পদার্থ পৃথক হইয়া গিয়াছিল।

যখন তোমরা বিদ্যালয়ে রসায়ন-বিদ্যা অধ্যয়ন করিবে তখন তোমাদের শিক্ষক পরীক্ষাগারে তোমাদের সম্মুখে উহা দেখাইয়া দিবেন।

বর্ণমালার অ আ হইতে আরম্ভ করিয়া হ পর্য্যন্ত অক্ষরগুলি যেন মূল পরমাণু সকল। এই অক্ষরগুলির ভিন্ন ভিন্ন রকম মিলনে মানুষ, ঘটি, বাটি প্রভৃতি পদ সকল গঠিত হইয়াছে। সেইরূপ বিরানব্বইটী পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন রকম মিলনে জগতের যাবতীয় পদার্থ গঠিত হইয়াছে। ইহাদের এই প্রকার মিলন এক সময়ে স্বাভাবিক উপায়ে হইয়াছিল কিন্তু রাসায়নিকগণ উহাদের গোটা কতক লইয়া কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের নানাপ্রকার মিশ্রণে পৃথক পৃথক দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতেছেন। দুইটা উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি। দুই ভাগ জলজান ও এক ভাগ অম্লজান মিশাইয়া জলের উৎপত্তি হয়, তাঁহারা দুই ভাগ জলজান ও দুই ভাগ অম্লজান মিলাইয়া এমন একটী পৃথক পদার্থ তৈয়ার করিয়া থাকেন যাহা চিকিৎসকগণ রোগীর ক্ষতস্থানে লাগাইয়া ক্ষত পরিষ্কার করেন। এক ভাগ অঙ্গার দুই ভাগ অম্লজান মিলাইয়া যে একটী বাষ্প উৎপন্ন হয় তাহা যে বায়ু আমরা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস করি তাহার সহিত মিশ্রিত থাকে ; তাঁহারা এক ভাগ অঙ্গার ও এক ভাগ অম্লজান মিলাইয়া এমন একটী বিষাক্ত বাষ্প তৈয়ার করেন যাহার নিশ্বাস গ্রহণ করিলেই মানুষের প্রাণ বিয়োগ হয়।

এই সকল অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করিলে তোমরা আমাদের দেহ কি কি পদার্থে তৈয়ার হইয়াছে তাহার কিছু কিছু সন্ধান পাইবে। তোমরা যখন জীব-বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক সকল পাঠ করিবে তখন জানিতে পারিবে যে অতি ক্ষুদ্র বীজাণু যাহা জলে ভাসিয়া বেড়ায় তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্য্যন্ত যাহাদের প্রাণ আছে সমস্তই প্রোটপ্লাজম্ (Protoplasm) নামক এক প্রকার পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রোটপ্লাজম্ ইংরাজি কথা উহার বাংলা অর্থ আদিপ্রাণী। ইহা লালার ন্যায় এক প্রকার

পদার্থ। যথন পৃথিবীর উপরে কোন জীব-জন্তু ছিল না তথন সমুদ্রের জলে এই প্রোটপ্লাজম্ নামক পদার্থ বিন্দু বিন্দু আকারে ভাসিয়া বেড়াইত। এই প্রটোপ্লাজমের প্রাণ আছে। ইহা আহার করে, বড় হয় এবং আপনাকে বিভাগ করিয়া অপর প্রোটপ্লাজম্ উৎপন্ন করে। ইহা এক বিন্দু আঠার মত পদার্থ হইলেও ইহা নিষ্ক্রিয় নহে। রাসায়নিকগণ ইহার দেহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহাতে ৪০০ ভাগ অঙ্গার, ১২০ ভাগ অম্লজান, ৩১০ ভাগ জলজান, ৫০ ভাগ যবক্ষারজান, ২ ভাগ গন্ধক ও ২ ভাগ ফস্ফরাস্ আছে। কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে যথন পৃথিবীতে কোন প্রকার জীব-জন্তু জন্মায় নাই তথন পৃথিবীর উপরিভাগে কোন এক স্থানে কোন কারণে এই কয়েকটী মূল পদার্থ একত্র মিলিত হইয়াছিল ও তাহাতে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ পতিত হওয়ায় উহাদের মধ্যে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে উহাতে প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহাই প্রোটপ্লাজম্ নামক পদার্থের উৎপত্তির ইতিহাস। এই প্রোটপ্লাজম্ হইতেই জগতের যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। রাসায়নিকগণ তাহাদের পরীক্ষাগারে ঐ সকল মূল পদার্থ একত্র করিয়া তাহাতে তাপ আলোক প্রভৃতির সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে প্রোটপ্লাজম্ উৎপন্ন করিবার চেষ্টায় আছেন কিন্তু এক সময়ে যাহা আপনা হইতে হইয়াছিল মানুষ আজও তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দিন দিন যে ভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে কালে হয়তো উহা করিতে সমর্থ হইবে।

এইবার আমি তোমাদের এমন একটী কথা বলিব যাহা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য মনে করিবে। সাধারণ লোকের ধারণা অচেতন পদার্থ কথন আপনা হইতে নড়ে না। আমি দেখাইব তাহাদের এইরূপ ধারণা ভুল। অচেতন পদার্থের অণুসকল অনবরত নড়াচড়া করে। খানিকটা

জল একটা থালায় ঢালিয়া রাখ। থানিক পরে দেখিবে জলটা একটু কমিয়া গিয়াছে। জল কমিবার কারণ এই যে জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা অণুসকল অনবরত নড়াচড়া করিতেছিল। থালার উপরকার জলের অণুসকল অনবরত নড়াচড়া করিতে থাকায় বাতাসে তাহাদের সহজে উড়াইয়া লইয়া যায় তজ্জন্ম থালার জল কমিয়া যায়। থালার তলায় যদি আগুনের উত্তাপ দাও ঐ জল গরম হইয়া উঠিবে এবং উহার অণুসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে নড়াচড়া করিতে থাকিবে। তখন বাতাসে উহাদের উড়াইয়া লইয়া যাওয়া সহজ হওয়ায় জল শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যাইবে। পেটরল্ একটা পাত্রে ঢালিয়া রাখিলে একটু পরে দেখিবে উহা কমিয়া গিয়াছে। পেটরলের অণুসকল অত্যন্ত বেগে নড়াচড়া করে এজন্ম সহজে উহা বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া উবিয়া যায়। পেটরলের টিনের ঢাকনি খুলিয়া তাহার মুখের কাছে একটা দেশলাই জ্বালিলে টীনের ভিতরকার পেটরল্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং ভয়ঙ্কর একটা অগ্নিকাণ্ড হইয়া যায়। এজন্য কলিকাতার রাস্তায় যেখানে পেটরল্ পম্প আছে পম্প হইতে মোটর গাড়ীতে পেটরল্ ভরিয়া লইবার সময় সেখানে চুরট খাইতে নিষেধ।

কেবল যে তরল ও বাষ্পীয় পদার্থের অণুসকল অনবরত নড়াচড়া করে তাহা নহে। কঠিন পদার্থের অণুসকলও ঐরূপ সর্ব্বদা নড়াচড়া করিয়া থাকে। একখণ্ড সোনা ও একখণ্ড সীসা লও। ইহারা উভয়েই অচেতন ও কঠিন পদার্থ। এই দুইটা গায়ে গায়ে ঠেকাইয়া কয়েক বৎসর এক যায়গায় রাখিয়া দাও, পরে দেখিবে সোনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল সীসার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় এই দুইটী পদার্থ স্থির ছিল না, তাহাদের অণুসকল নড়াচড়া করিতেছিল।

সোনা ও সীসা কঠিন পদার্থ হইলেও উহাদের অণু সকল অনবরত

নড়াচড়া করিয়া থাকে। সকল প্রকার কঠিন পদার্থেরই অণুসকল অনবরত নড়াচড়া করে। জলীয় পদার্থের অণুসকল তাহাদের অপেক্ষা বেগে নড়াচড়া করে এবং বাষ্পীয় পদার্থের অণুসকল অত্যন্ত বেগে নড়াচড়া করে। এজন্য পদার্থ মাত্রেরই প্রাণ আছে বলা যাইতে পারে। প্রোটপ্লাজমে যে প্রাণের ক্রিয়া দেখা যায় তাহা তাহার অন্তর্গত অণুসকলের স্বাভাবিক নড়াচাড়া হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

পদার্থ সকলের মূল উপাদান কি ?

আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিরানব্বইটী মূল পদার্থের কথা বলিয়াছি। এই মূল পদার্থগুলি কি রকম করিয়া রাসায়নিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার আভাষ দিতেছি। জগতের সমুদয় পদার্থ এই বিরানব্বইটী মূল পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই মূল পদার্থগুলির মধ্যে কতকগুলি জগতের অধিকাংশ পদার্থে-ই বর্ত্তমান আছে, বাকীগুলির অস্তিত্ব খুব কম দেখা যায়। এই বিরানব্বইটী মূল পদার্থ যে শেষ আবিষ্কার তাহা আমরা বলিতে পারি না, হয়তো পরে আরও দুই-চারটা নূতন আবিষ্কার হইতে পারে। তাহা হইলেও আমরা সচরাচর যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই তাহাতে কয়েকটী মাত্র মূল পরমাণুর অস্তিত্ব জানা যায় অবশিষ্টগুলির ব্যবহার খুব কমই হইয়াছে।

যে কোন বস্তুকে কেহ যদি অনবরত খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে শেষে তাহার একখণ্ড এমন ছোট হইবে যে তাহাকে আর ভাগ করা যায় না। কোন বস্তুর সেইরূপ খণ্ডকে আমরা তাহার অণু বলি। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা সেই অণুসকল যে যে মূল পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে সেই সকল মূল পদার্থ পৃথক করিতে পারি। এই মূল পদার্থ সকলকে আমরা পরমাণু বলি। কেমন করিয়া আমরা পদার্থকে ভাঙ্গিয়া তাহার মূল পদার্থ বাহির করিতে পারি তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। জল একটা পদার্থ। উহার এমন এক বিন্দু জল যাহা অপেক্ষা আর ছোট বিন্দু হইতে পারে না তাহাই ঐ জলের অণু। খানিকটা জল

এক পাত্রে রাখ। উহার ভিতর বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইয়া দিলে ঐ জল-টুকু অম্লজান ও জলজান বাষ্পে পরিণত হইবে। এই দুই প্রকার বাষ্পের মিশ্রণে জলের উৎপত্তি হইয়াছিল। সুতরাং উহারাই জলের মূল উপাদান। এই মূল পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশ যাহাকে আর ভাগ করা যায় না তাহাই জলের মূল উপাদানের অবিভাজ্য সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ পরমাণু বা এটম। জগতের প্রত্যেক বস্তু কতকগুলি অণু (molecule) একত্র হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক অণু আবার কতকগুলি মূল পরমাণু বা এটম একত্র হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

একটী পরমাণুর আকার কত বড় তাহার একটা আন্দাজ দিতেছি। যদি দশ কোটী পরমাণু এক লাইনে সাজান যায় তাহা হইলে মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা হইবে। এই পৃথিবী একটা টেনিস্ বল হইতে যত গুণ বড় একটা টেনিস্ বল একটা পরমাণু হইতে তত গুণ বড়। পরমাণুর আবার গুরুত্ব আছে। পরমাণু সকলের মধ্যে জলজানের পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু এবং উরনিয়মের পরমাণু সকল পরমাণু অপেক্ষা ভারি।

পরমাণু সকলের জাতি বিভাগ আছে। বিরানব্বইটী পরমাণুকে যদি লাইন করিয়া বসাইয়া দাও দেখিবে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এক জাতীয় অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, অপর কতক-গুলি অন্য জাতীয় তাহাদের মধ্যে অন্য প্রকার বিশেষত্ব আছে। যেমন এক স্থানে কতকগুলি লোক জড় হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা ইংরাজ তাহারা এক রকম, যাহারা বাঙ্গালী তাহারা আর এক রকম, যাহারা চীনা তাহারা অন্য রকম কিন্তু সকলেই মানুষ। মানুষের যেমন এক জাতির সহিত অন্য জাতির মেলা-মেশা সুবিধাজনক হয় না, এক জাতীয় পরমাণুর সহিত অন্য জাতীয় পরমাণুর সেরূপ বনিবনাও হয় না। হিলিয়ম, নিয়ন, আরগণ ইহারা এক জাতীয়, অন্য জাতীয় পরমাণুর সহিত

ইহাদের বনিবনাও হয় না। লিথিয়ম্, সোডিয়ম্, পটাসিয়ম্ ইহারা আর এক জাতি যেন তিনটী ভাই।

১৪৯৭ খৃঃ অব্দে কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে হেনেরি বোকারেল নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এমন একটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহাকে ম্যাজিকের মত আশ্চর্য্য ব্যাপার বলা যাইতে পারে। তিনি ফটোগ্রাফ তুলিয়া যাহাতে তাহার প্লেটে আলো না লাগে এমন করিয়া বন্দ করিয়াছিলেন। যথা সময়ে প্লেট বাহির করিয়া দেখিলেন কোথা হইতে তাহার মধ্যে আলো প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্লেট নষ্ট করিয়া দিয়াছে অথচ আলো প্রবেশ করিবার কোন পথই তিনি রাখেন নাই। এরকম কেন হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে দেখিলেন খানিকটা উরানিয়ম্ নিকটে পড়িয়াছিল। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন উরানিয়ম্ হইতে এক প্রকার অদৃশ্য আলো অনবরত বাহির হইয়া থাকে যাহা কাঠ ও কাগজের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্লেট নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ঐ আলোক দুইটী বিভিন্ন প্রকার তড়িৎ-প্রবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটির নাম পুং-তড়িৎ বা পজেটিব ইলেক্‌ট্রিসিটী অপরটীর নাম স্ত্রী-তড়িৎ বা নেগেটিব ইলেক্‌ট্রিসিটী। বিন্দু বিন্দু তড়িৎ-কণা কোন দ্রব্য হইতে বাহির হইয়া একটা লাইন ধরিয়া ছুটিয়া গেলে তাহাকে তড়িৎ-প্রবাহ বলা হয়। স্ত্রী তড়িৎ-প্রবাহ আলোকের গতির মত প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ সাতাশি হাজার মাইল বেগে যায়। পুং-তড়িৎ প্রবাহের বেগ উহা অপেক্ষা একুশ গুণ কম। যখন কোন পদার্থে পুং ও স্ত্রী তড়িতের সংখ্যা সমান থাকে তখন উহাদের কোন কার্য্য হয় না। তোমাদের সম্মুখে চেয়ার, টেবিল, কাগজ, কলম যাহা কিছু দেখিতেছ এ সকলের মধ্যে বিদ্যুৎ আছে কিন্তু উহাদের

হইতে আগুনের ফুল্‌কি বাহির হয়না বা উহাদিগকে ছুঁইলে ধাক্কা লাগেনা, কারণ, উহাদের ভিতরকার পুং-তড়িৎ বা পজেটিব ইলেক্‌ট্রিসিটি ও স্ত্রী-তড়িৎ বা নেগেটিব ইলেক্‌ট্রিসিটি সমান পরিমাণে আছে। যদি কোন কৌশলে উহাদের কোনও একটীর পরিমাণ কম বেশী করা যায় তখন ঐ সকল বস্তু বিদ্যুৎ-শক্তি বিশিষ্ট হয়। কাঁচ, গালা প্রভৃতিকে সহজে বিদ্যুৎশক্তি বিশিষ্ট করা যায়। বিদ্যুৎশক্তি বিশিষ্ট হইলে উহাতে বিদ্যুতের ক্রিয়া সকল প্রকাশ পায়। তোমরা যখন কলেজে পড়িবে শিক্ষক পরীক্ষাগারে তোমাদিগকে উহা দেখাইয়া দিবেন।

উরানিয়ম্‌ একটী মূল পদার্থ তাহা হইতে তড়িৎ-কণা সকল অদৃশ্য আলোক-রশ্মিরূপে দিন রাত্রি অনবরত বাহির হইয়া থাকে। এইরূপ হওয়াতে বহুকাল পরে উরানিয়ম্‌, রেডিয়ম্‌ নামক মূল পদার্থে পরিণত হয়। আবার রেডিয়ম্‌ হইতে ঐরূপ অনবরত তড়িৎ-কণা সকল বাহির হইয়া বহুকাল পরে উহা পলোনিয়ম্‌ নামক মূল পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে।

এই অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে জানা গেল,—

বিরানব্বইটী মূল পদার্থের মধ্যে কয়েকটী মাত্র সচরাচর দেখা যায় বাকীগুলি অতি বিরল।

মূল পদার্থ সকলের মধ্যে এক এক জাতীয় মূল পদার্থের পরস্পর সৌসাদৃশ্য আছে।

প্রোটপ্লাজম্‌ নামক আদি সজীব পদার্থ হইতে যেমন ক্রমবিকাশ হইয়া নানাবিধ জীব জন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে সেইরূপ কোন একটী আদি মূল পদার্থ হইতে অন্যান্য সমুদয় মূল পদার্থগুলির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

মূল পদার্থ সকলের সর্ব্বাপেক্ষা ছোট যে অংশ যাহাকে আর বিভাগ করা যায় না তাহাকে পরমাণু বা এটম বলা হয়।

এতদিন সকলের ধারণা ছিল যে প্রত্যেকে প্রকার পরমাণু এক এক প্রকার পৃথক পদার্থ, ইহাদের কোন পরিবর্ত্তন হয়না। কিন্তু ইদানি দেখা গিয়াছে যে ভারি পরমাণু সকল হইতে কিছু কিছু বিদ্যুৎকণা ক্রমশঃ বাহির হইয়া যাওয়ায় লঘু পরমাণু সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পরমাণু ভঙ্গ হইলে উহা হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

পরমাণুর গঠন (Atomic Structure)

আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিরানব্বইটী আদি পদার্থের (atom) কথা বলিয়াছি। উহাদের পরমাণু সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক মনে করি। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যভাগে কতকগুলি বিদ্যুৎ-কণা একত্র হইয়া বর্ত্তমান থাকে। এই বিদ্যুৎ-কণাগুলিকে প্রোটন বা পুংজাতীয় (positive) তড়িৎ বলা হয়। আবার কতকগুলি বিদ্যুৎ-কণা যাহাদিগকে ইলেকট্রন বা স্ত্রীজাতীয় (negative) তড়িৎ বলা হয়, তাহারা উক্ত প্রোটনগুলিকে বেষ্টন করিয়া অবিরত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এক একটী পরমাণুতে এই উভয় জাতীয় বিদ্যুৎ-কণা সকল তুল্য সংখ্যায় থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের প্রতিক্রিয়ায় উভয়ের বিশিষ্ট ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্যভাবে থাকে। যদি কোন পরমাণুতে প্রোটন অপেক্ষা ইলেকট্রনের সংখ্যা কম বা বেশী থাকে তাহা হইলে সেই পরমাণুর সাম্যভাব না হইয়া তাহার মধ্যে এক প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ হয়। রেডিয়ম্ নামক পরমাণুতে ঐরূপ থাকায় উহা হইতে আলোকরশ্মি রূপে বিদ্যুৎ-কণা সকল অনবরত বাহির হইয়া থাকে।

একটী প্রোটন বা পুং-তড়িৎকে বেষ্টন করিয়া যে সকল ইলেকট্রন বা স্ত্রী-তড়িৎ পরিভ্রমণ করে তাহারা এলোমেলোভাবে বিচরণ করে এরূপ মনে করিও না। প্রকৃতির কার্য্যে কোথাও এলোমেলোভাব বা বিশৃঙ্খলা নাই। যে নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন হইয়া আকাশে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে

এবং কালে পরিভ্রমণ করে প্রত্যেক পরমাণুতে প্রোটনকে বেষ্টন করিয়া ইলেক্‌ট্রন সকল সেই প্রকার নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কতকগুলি প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনের একত্র সমাবেশ হইতে পরমাণু সকলের উৎপত্তি হইলেও এরূপ মনে করিও না যে কতকগুলি প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন একত্র জমাট বাঁধিয়া এক একটী পরমাণুর সৃষ্টি হইয়াছে। একটী পরমাণুতে যে সকল প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন আছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট আকাশ ব্যবধান থাকে। যদি একটী পরমাণুর পরিসর কলিকাতার গড়ের মাঠের সমান কল্পনা করা যায় তাহা হইলে ঐ পরমাণুস্থ ইলেক্‌ট্রনগুলির স্থিতি ঐ মাঠে ভ্রমণকারী লোকগুলির অবস্থান যেরূপ ফাঁক ফাঁক সেই মত দেখাইবে। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে উহা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় না। উহাকে কল্পনার সাহায্যে ধরিয়া লইতে হইবে। একটী পরমাণুর আকারের সহিত একটী ইলেক্‌ট্রনের আকারের তুলনা করিতে হইলে, একটী পরমাণুকে লাট সাহেবের বাড়ীর মত বড় মনে করিতে হইবে এবং ইলেক্‌ট্রনকে ঐ বাড়ীতে যে সকল মশা আছে তাহাদের মত বড় মনে করিতে হইবে।

এক্ষণে জানা গেল যে, এক একটী পরমাণুতে এক বা ততোধিক স্ত্রী-তড়িত বা ইলেক্‌ট্রন মধ্যবর্ত্তী একটী বা ততোধিক পুং-তড়িত বা প্রোটনকে বেষ্টন করিয়া কতিপয় নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া শৃঙ্খলার সহিত ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট আকাশ ব্যবধান থাকে। এই মধ্যবর্ত্তী প্রোটন বা পুং-তড়িতকে পরমাণুর সার বস্তু (nucleus) বলে। পরমাণুর সার বস্তুকে বেষ্টন করিয়া যে যে সকল ইলেক্‌ট্রন ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা কোন আবরণীর মধ্যে থাকে কি না এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনে উত্থিত হইতে পারে। বাস্তবিক পরস্পর বিচ্ছিন্ন

অথচ একত্র সমাবিষ্ট ইলেকট্রন সকল পরমাণুরূপে আকাশে কোন আবরণীর মধ্যে নাই। শূন্যময় আকাশে ইলেকট্রন সকল প্রোটনরূপ একটী সার বস্তুকে বেষ্টন করিয়া কোন আবরণীর মধ্যে না থাকিলেও বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়ে না। যে কারণে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি আকাশে পরিভ্রমণ করে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় না সেই কারণেই পরমাণুস্থ ইলেকট্রন বা স্ত্রী-তড়িত-কণা সকল প্রোটন বা পুং-তড়িত-কণা সকলকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করে কদাচ বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়ে না। একজাতীয় একটী পরমাণু অন্য জাতীয় এক বা ততোধিক পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া একটি অণুর (molecule) সৃষ্টি হয়। এই অণুই আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সকলের সূক্ষ্মাংশ।

পঞ্চম অধ্যায়

জগতের সমুদয় পদার্থেরই আদি বিদ্যুৎ

আমরা জানিয়াছি জগতের সমুদয় পদার্থ মায় আমাদের দেহ বিরানব্বই প্রকার মূল পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত বিরানব্বই প্রকার মূল পরমাণু আবার পুং-তড়িৎ ও স্ত্রী-তড়িৎ দুই প্রকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির সমাবেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক প্রকার পরমাণু হইতে খানিকটা তড়িৎ বাহির হইয়া গেলে উহা অন্য প্রকার পরমাণুতে পরিণত হয়। যেমন উরানিয়ম্ নামক এক প্রকার ভারি পরমাণু হইতে কিয়ৎপরিমাণে তড়িৎ বাহির হইয়া গেলে উহা অপেক্ষা লঘু রেডিয়ম্ নামক পরমাণুর উৎপত্তি হয়। আবার রেডিয়ম্ হইতে ঐরূপে পলোনিয়ম্ এবং পলোনিয়ম্ হইতে সীসার উৎপত্তি হয়। সুতরাং আমাদের দেহ ও জগতের যাবতীয় পদার্থ আদিতে তড়িৎ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

এখন তোমরা যদি কেহ জিজ্ঞাসা কর তড়িৎ জিনিসটা কি তাহা হইলে আমাকে বিষম মুস্কিলে পড়িতে হইবে। বাস্তবিক তড়িৎ পদার্থ-টা ঠিক কি তাহা আমরা জানি না তবে উহা একটী শক্তি বিশেষ যাহার কার্য্য-প্রণালী আমরা জানিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি একটী পরমাণুতে এক বা ততোধিক পুং-তড়িৎকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি স্ত্রী-তড়িৎ ঘুরপাক দিয়া নাচিয়া বেড়ায়। ঠিক যেমন সূর্য্যকে মধ্যে রাখিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া গ্রহ ও উপগ্রহগণ ঘুরিয়া বেড়ায়। জলজানের পরমাণুতে একটী মাত্র পুং-তড়িৎ ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া একটী মাত্র স্ত্রী-তড়িৎ

ঘুরিয়া বেড়ায় এজন্য জলজানের পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। সর্ব্বাপেক্ষা ভারি পরমাণু উরানিয়মে ২৩৮টী পুং-তড়িৎ থাকে এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া ঐ পরিমাণে স্ত্রী-তড়িৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। পরমাণুর অন্তর্গত পুং ও স্ত্রী-তড়িতের সংখ্যার তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার পরমাণু সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। যদি কোন পরমাণুতে পুং ও স্ত্রী-তড়িতের সংখ্যা সমান থাকে তাহা হইলে কোন গোলযোগ থাকে না। আর যদি স্ত্রী-তড়িতের সংখ্যা পুং-তড়িতের অপেক্ষা বেশী হয় অতিরিক্ত স্ত্রী-তড়িৎ সকল একে একে দল ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে থাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের সংখ্যা সমান না হয়। রেডিয়ম্ নামক পরমাণুতে এইরূপ হইয়া থাকে। তাহা হইতে অনবরত স্ত্রী-তড়িৎকণা বাহির হইতে থাকায় উহা হইতে সর্ব্বদা আলোক রশ্মি বাহির হইতে থাকে।

তড়িৎ সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত জানিয়াছি যে,—

তড়িৎ এক প্রকার শক্তি বিশেষ।

জগতের সমুদয় পদার্থই তড়িৎ হইতে উৎপন্ন।

পরমাণুগুলি ঐ শক্তির গুদাম। উহার এক একটীতে ভয়ঙ্কর প্রবল শক্তি আবদ্ধ আছে।

যদি কোন পরমাণুর কেন্দ্রস্থ পুং-তড়িতের দল ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইতে এত প্রবল শক্তি বাহির হইবে যে যদি আমরা তাহাকে পলাইতে না দিয়া আবদ্ধ করিয়া কাজে লাগাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ছয় মাসে যত রেল গাড়ী চলে তাহাদের জন্য কয়লা কিনিতে হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পৃথিবীর জন্ম-কথা

আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম কেমন করিয়া হইল তাহা একটু মোটা-মুটি জানা আবশ্যক। প্রায় দুইশত কোটী বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের খানিকটা অংশ খসিয়া পড়িয়া পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় পৃথিবী একটী গরম বাষ্পপিণ্ড ছিল। তোমরা দেখিয়াছ গরম জিনিস মাত্র খানিকক্ষণ বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে তাহার উত্তাপ তাহা হইতে বাহির হইয়া আকাশে চলিয়া যায়। তখন উহা শীতল হইয়া যায়। গরম বাষ্পময় পৃথিবীর উপরিভাগের উত্তাপ কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া আকাশে উবিয়া যাওয়ায় উহার উপরিভাগ শীতল হইয়া তাহাতে মাটি, জল, বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছিল। পৃথিবীর উপরিভাগের গরম বাষ্প সকল যেমন শীতল হইতেছিল ঐ বাষ্প জল হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া অনবরত পৃথিবীর উপর বৃষ্টিরূপে পড়িয়াছিল, তাহাতে সমুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। পৃথিবীর ভিতরটা এখনও পূর্ব্বকার মত গরমই আছে। সমুদ্র উৎপন্ন হওয়ার পর কয়েক লক্ষ বৎসর ধরিয়া ঘন ঘন ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার ফলে পৃথিবীর ভিতরকার অত্যন্ত গরম তরল পদার্থ সকল ঠেলিয়া উঠিয়া পর্ব্বত সকলের উৎপত্তি হইয়াছিল। পর্ব্বতের উপর বৃষ্টির জল পড়ায় নদী সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। নদী সকল উৎপন্ন হওয়ার পর বৃষ্টির জলে পর্ব্বত সকলের গা হইতে বালি, মাটি, শুকনা গাছ, মরা জন্তুর হাড় প্রভৃতি ধুইয়া আসিয়া নদীতে পড়ে এবং নদীর স্রোতে তাহাদের বহিয়া লইয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। এইরূপে

পৃথিবীর উপরে সময়ে সময়ে এক একটী ছাল বা স্তর পড়ে। এই সকল স্তর পড়িতে প্রত্যেকটীতে সাত-আট লক্ষ বৎসর লাগিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কালকে আমরা এক একটী যুগ বলিব। ঐ এক একটী স্তর বার-তের হাজার ফুট হইতে চার-পাঁচ হাজার ফুট পুরু হইয়াছিল। তোমরা যখন ভূবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক সকল পড়িবে তখন ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবে। এখন এই পর্য্যন্ত জানাই যথেষ্ট।

এই পৃথিবী কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া ক্রমে ক্রমে এখন যেমন দেখিতেছ তেমনিটী হইয়াছে। পৃথিবীতে প্রথমে যখন কেবল সমুদ্র ছিল তখন তাহার উপর গাছ-পালা জীব-জন্তু কিছুই ছিল না। তাহার পর কোন এক সময়ে সমুদ্র-জলে আঠার মত এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়া বিন্দু বিন্দু আকারে সমুদ্র-জলে ভাসিয়া বেড়াইত। এই পদার্থকে প্রোটপ্লাজম্ বলা হয় এবং ইহাতেই প্রথম প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। পৃথিবীর উপরিভাগে যে সকল স্তরের কথা বলিয়াছি এক এক যুগে উহার এক এক স্তরে এক এক প্রকার উদ্ভিদ ও জীব-জন্তু সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম স্তরে শামুক-গেঁড়ি জাতীয় জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, দ্বিতীয় স্তরে মাছ প্রভৃতি, তৃতীয় স্তরে সরীসৃপ সকল, চতুর্থ স্তরে পক্ষী সকল, পঞ্চম স্তরে স্তন্যপায়ী জীব সকল এবং সর্ব্বশেষ স্তরে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহা জানিতে পারিয়াছেন।

ইহা হইতে জানা যায় যে আঠার মত সামান্য প্রোটপ্লাজম্ হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া ক্রমবিকাশ হইয়া শামুক-গেঁড়ি হইতে মানুষ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। তোমরা যখন বড় হইবে অসাধারণ পণ্ডিত ডারউইন সাহেবের রচিত পুস্তক সকল পাঠ করিলে জীবের ক্রমবিকাশ কি তাহা বুঝিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

সূর্য্য ও গ্রহগণ

ইতিপূর্ব্বে আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশে আমরা আছি তাহারই বিষয় বলিয়াছি। এইবার অপর অংশ যেটা আমরা মাথার উপর দেখিতে পাই তাহারই বিষয় কিছু বলিব। আমি যদি বলি আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সূর্য্য যে সকল মূল পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়াছে আমাদের পৃথিবীতে সেই সকল মূল পদার্থ সমস্তই আছে; আমরা সূর্য্য ও নক্ষত্র সকলের ওজন কত বলিতে পারি; আমরা যন্ত্রের সাহায্যে দেখাইতে পারি নক্ষত্র সকল পৃথিবীর দিকে আসিতেছে কি পৃথিবী হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে এবং কতকগুলি নক্ষত্র পৃথিবী হইতে এত দূরে আছে যে তাহাদের হইতে প্রথম উৎপন্ন আলোক তিন হাজার বৎসর ধরিয়া প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে আসিয়াও মাত্র কয়েক বৎসর হইল পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে অথবা আজিও পৌঁছায় নাই, তাহা হইলে তোমরা কি আশ্চর্য্যান্বিত হও না? ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করা অপেক্ষা এই সকল বিষয় জানিতে তোমাদের কি অধিক আগ্রহ হয় না?

আমরা আকাশের দিকে তাকাইলে কি দেখিতে পাই? দিনের বেলা সূর্য্যকে আমাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখি। রাত্রিতে চন্দ্রকে ঐরূপ চলিয়া যাইতে দেখি। আকাশের অনেক উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র সকল চিক্‌মিক্ করিতেছে দেখিতে পাই। তাহাদের দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা আকাশের চাঁদোয়ার নিচে স্থির হইয়া আছে।

ইহা ছাড়া এক একদিন রাত্রে আকাশ হইতে নক্ষত্রের মত কি পড়িতেছে দেখিতে পাই—যাহাকে আমরা উল্কাপাত বলিয়া থাকি। অনেক বৎসর অন্তর কখন কখন ধুমকেতু নামে ঝাঁটার মত কি একটা উজ্জ্বল পদার্থ আকাশে উদয় হইয়া কিছুদিন পরে অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখি। ইহারা কি পদার্থে নির্ম্মিত, পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, কেমন করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল এ সকল জানিতে কি তোমাদের কৌতূহল হয় না ?

তোমরা আকাশে যে সকল নক্ষত্র স্থিরভাবে রহিয়াছে দেখিতে পাও সূর্য্য ঐরূপ একটা নক্ষত্র। আমরা যদি নক্ষত্র-লোকে গিয়া সেখান হইতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে সূর্য্যকে একটী নক্ষত্রের মত আকাশে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে দেখিতে পাইব। পৃথিবী হইতে নক্ষত্রগণ যত দূরে আছে সূর্য্য তাহা অপেক্ষা অনেক নিকটে আছে বলিয়া সূর্য্যকে অত বড় দেখি।

এইবার আমি পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল কত দূরে আছে ও তাহাদের আকার কত বড় তাহার একটা ধারণা তোমাদের করাইয়া দিতেছি। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। নক্ষত্র সকলের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্র পৃথিবী হইতে এত দূরে আছে যে তাহাদের হইতে প্রথম যে আলোক বাহির হইয়াছিল সেই আলোক প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে আসিয়াও পৃথিবীতে পৌঁছিতে সাড়ে-চার বৎসর লাগিয়াছিল। যদি কেহ এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল যায় সাড়ে-চার বৎসরে সে কত মাইল যায় হিসাব করিয়া দেখ। সেই সকল নক্ষত্র পৃথিবী হইতে তত মাইল দূরে আছে।

একটা গোলাকার বস্তুর উপর পিঠ হইতে তাহার কেন্দ্রের মধ্য দিয়া

অপর পিঠ পর্য্যন্ত যে মাপ তাহাকে ঐ বস্তর ব্যাস বলা হয়। পৃথিবী এত বড় যে উহার ব্যাস ৮৭০০ মাইল। চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট উহার ব্যাস ২১৬০ মাইল। সূর্য্য পৃথিবীর ১০৮ গুণ বড়, অথচ আকাশে এত বড় সূর্য্যকে একটী থালার মত দেখায়। সূর্য্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে থাকায় উহাকে অত ছোট দেখায়। কোন কোন নক্ষত্র সূর্য্য হইতেও বড় অথচ একটী বিন্দুর মত দেখায়, তাহার কারণ পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত দূরে আছে তাহা অপেক্ষা ঐ সকল নক্ষত্র অনেক বেশী দূরে আছে।

সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যে সকল নক্ষত্র ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে গ্রহ (Planet) বলে। গ্রহগণকে বেষ্টন করিয়া যে সকল ছোট ছোট নক্ষত্র ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে উপগ্রহ (Satilite) বলে। বুধ (Mercury) শুক্র (Venus) পৃথিবী (Earth) মঙ্গল (Mars) বৃহস্পতি (Jupitar) শনি (Saturn) উরেনস্ (Uranus) নেপচুন (Neptune) এই কয়েকটী গ্রহ ইহারা সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরে। গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। পৃথিবীর ১, মঙ্গলের ২, বৃহস্পতির ৯, শনির ৯, উরেনসের ৪, নেপচুনের ১ উপগ্রহ আছে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরে।

প্রাচীন কালের লোকেরা আকাশের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাইতেন সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি আকাশে উদয় হইয়া অস্ত যায়। এইজন্য এই সাতটীকে তাঁহারা গ্রহ বলিতেন এবং তদনুসারে সাতটী বারের নামকরণ করিয়াছিলেন। প্রাচীনদিগের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। সূর্য্য গ্রহ নহে, চন্দ্র একটী উপগ্রহ। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে তৎকালে এই গ্রহগুলির আকাশের স্থান বিশেষে অবস্থানের উপর সেই ব্যক্তির জীবনের উন্নতি ও কৃতকার্য্যের

সফলতা নির্ভর করে এবং এই গ্রহগুলি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। বিপদে পড়িলে বা কঠিন পীড়া হইলে গ্রহগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদের পূজা করিতেন। হিন্দুগণ এখনও পুরোহিতের দ্বারা সস্ত্যয়ন ও গ্রহশান্তি করিয়া থাকেন।

সূর্য্য যে সকল মূল পরমাণু হইতে উৎপন্ন তাহাদের সমস্তই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্র-মণ্ডলীতে পাওয়া যায়। সুতরাং আদিতে ইহারা সকলেই একই প্রকার পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। যদি বল আপনি কেমন করিয়া জানিলেন পৃথিবী যে সকল মূল পদার্থে নির্ম্মিত, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্র প্রভৃতি সেই সকল মূল পদার্থে নির্ম্মিত? আপনি তো এইমাত্র বলিলেন পৃথিবী হইতে সূর্য্য নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে আপনাদের মধ্যে কেহ কি সূর্য্যে গিয়া তাহার কোন অংশ লইয়া আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন? তোমাদের এরূপ প্রশ্ন করা অতি স্বাভাবিক। আমরা কেমন করিয়া সূর্য্য প্রভৃতি কোন্ কোন্ পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে জানিয়াছি তাহা বলিতেছি।

তিনপলে কাঁচের বাতি যাহা আমাদের ঝাড় লণ্ঠনের নিচে ঝুলান থাকে তাহাকে ইংরাজিতে প্রিজম্ (Prism) বলে। ঐ কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিলে রামধনুর রংএর মত রং সকল দেখা যায়। যদি আমরা একটা ছিদ্র দিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করাইয়া দেই, দেখিবে ঘরের ভিতরকার দেওয়ালে একটী সাদা আলো পড়িয়াছে। ঐ ছিদ্রের সামনে যদি এক খণ্ড তেপলা কাঁচ ধরা যায় দেখিবে ঘরের ভিতরকার দেওয়ালে সাদা আলোর পরিবর্ত্তে রামধনুর মত রঙ্গিন আলো সকল পর পর সাজান রহিয়াছে। যদি কোন কৌশলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন রংএর আলোগুলি পর পর উপরি উপরি ফেলিয়া একত্র করা যায় দেখিবে পুনরায় সাদা আলো হইয়াছে। যে কোন পদার্থকে অতিরিক্ত গরম

করিলে তাহা হইতে একটা আলো বাহির হয়। ঐ আলো তেপলা কাঁচের ভিতর দিয়া বাহির করার নাম আলো বিশ্লেষণ বা স্পেক্‌ট্রম্ এনালিসিস্ (Spectrum Analysis) এবং ঐরূপ করিলে তাহার ভিতর দিয়া যে সকল নানা বর্ণের আলো বাহির হয় তাহাকে ঐ বস্তুর বিশ্লেষিত আলোক বা স্পেক্‌ট্রম্ (Spectrum) বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বিশ্লেষিত আলোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। ষ্ট্রনসিয়ম্ (Strontium) নামক এক প্রকার মূল পদার্থ আছে তাহাকে পোড়াইলে তাহা হইলে লাল বর্ণের আলোক বাহির হয়। এজন্য আতস-বাজি প্রস্তুতকারকেরা বারুদের সহিত ষ্ট্রনসিয়ম্ মিশাইয়া লাল আলো প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ষ্ট্রনসিয়মের আলোক বিশ্লেষণ করিলে যে বিশ্লেষিত আলোক সকল বাহির হয় তাহাতে লালের ভাগ খুব বেশী। যাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রে পণ্ডিত তাঁহারা পৃথিবীর যাট-সত্তর প্রকার মূল পদার্থের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটী হইতে যে সকল বিভিন্ন প্রকার বর্ণের বিশ্লেষিত আলোক বাহির হয় তাহা চিনিয়া রাখিয়াছেন এবং যে কোন বিশ্লেষিত আলোক দেখিলে বলিতে পারেন উহা কোন্ মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকারে আলো বিশ্লেষণ করিবার জন্য একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার নাম আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র (Spectroscope)। এইবার বুঝিলে আমরা সূর্য্যে না গিয়াও কেমন করিয়া সূর্য্য কোন্ কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত বলিতে পারি। আমরা সূর্য্যের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া যে বিশ্লেষিত আলোক দেখিতে পাই তাহার সহিত পৃথিবীস্থ যাট-সত্তর প্রকার মূল পদার্থের বিশ্লেষিত আলোকের মিল আছে। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে।

সূর্য্যকে মধ্যস্থানে রাখিয়া পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহ সকল

তাহাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা হইতে মনে হয়, যে সকল গ্রহ ও উপগ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহারা সূর্য্যেরই ছেলে-পুলে, কোন এক সময়ে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। চন্দ্র যেরূপ ভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাতে মনে হয় চন্দ্র পৃথিবীরই একটী ছানা, পৃথিবী হইতে কোন এক সময়ে সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী হইতে ছট্‌কাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

সূর্য্যের পরিবার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গ্রহ ও উপগ্রহ সকল স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া কমেট বা ধুমকেতু নামক এক একজন অতিথী মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখা দেয়। ইহারা বড় যে সে অতিথী নন। ইহাদের আকার উজ্জ্বল এক গাছি ঝাঁটার মত। ইহাদের মাথাটা এক লক্ষ বর্গমাইল লইয়া বিস্তৃত এবং লেজটা আঠার কোটী মাইল লম্বা। ইহাদের এক একজন বহুকাল পরে এক একবার আসিয়া দেখা দিয়া পনর-কুড়ি দিন থাকিয়া কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া যায়। ইহাদের দেহে জলজান, সোডিয়ম্ এবং লৌহ আছে জানা গিয়াছে।

সূর্য্যের পরিবারের মধ্যে উল্কা (Meteor) নামক ভিখারীর দল প্রায়ই আমদানি হয়। এক এক মাসে ইহাদের সংখ্যা বড় বেশী হয়। ইহারা বার মাস ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা যে পথে ভ্রমণ করে তাহা ডিম্বাকৃতি। পৃথিবী যে পথে ভ্রমণ করে তাহা গোলাকার। সুতরাং ইহারা চলিতে চলিতে কখন কখন পৃথিবীর খুব নিকট আসে আবার দূরে চলিয়া যায়। ইহাদের দল ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পৃথিবী যে পথে ঘুরে সেই পথে আসিয়া পড়ে পৃথিবীর সহিত দেখা হইয়া যায় ও ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে। ইহারা লৌহ ও অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত প্রস্তর খণ্ড বিশেষ। ইহারা পৃথিবীর উপর এত বেগে আসিয়া পড়িতে থাকে যে আসিতে

আসিতে গরম হইয়া জ্বলিয়া উঠে ও পুড়িয়া গ্যাস হইয়া অদৃশ্য হয়। যাহারা বড় বড় তাহারা কখন কখন জ্বলিতে জ্বলিতে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। আমরা তাহাদের দুই-একটাকে কুড়াইয়া লইয়া মিউজিয়মে রাখিয়া দিয়াছি।

তোমরা যখন জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়িবে তখন জানিতে পারিবে কি প্রকারে আমরা পৃথিবীর ওজন কত বলিতে পারি। তোমাদের এখন বলিলে উহা বুঝিতে পারিবে না কারণ উহা বুঝিতে হইলে গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগণ কত দূরে আছে তাহাও অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। যাহা এখন তোমাদের অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে তখন তাহা তোমাদের সহজ মনে হইবে।

যদি জিজ্ঞাসা কর সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্র সকল নির্দ্দিষ্ট পথে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা ছট্‌কাইয়া বাহির হইয়া যায় না কেন? তাহার উত্তরে আমি যাহা বলিব তাহা শুন। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আইজাক নিউটন নামে এক অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বৃক্ষ হইতে একটী আপেল ফলের পতন লক্ষ্য করিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে প্রত্যেক পদার্থ অপর পদার্থকে তাহার দিকে টানে। ঐ শক্তির বলে সূর্য্য, গ্রহগণ ও নক্ষত্রসকল পরস্পরকে টানিয়া রাখে। এই টানাটানির ফলে কেহ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে ছট্‌কাইয়া বাহির হইয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে যে বড় তাহার আকর্ষণ শক্তি যে ছোট তাহার অপেক্ষা বেশী ইহার ফলে ছোট বড়কে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। উরেনস্ নামক গ্রহ কিন্তু তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে এক একবার একটু দুলিয়া চলে। উহার ঐ প্রকার করিবার কারণ কি তাহা নিম্নে বলিতেছি।

১৮৪৩ খৃঃ অব্দে এডাম নামে একজন অঙ্কশাস্ত্রবিৎ উরানিয়সের ঐ প্রকার গতির কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তিনি অঙ্ক-শাস্ত্রের সাহায্যে গণনা করিয়া আকাশে এমন একটী স্থান নির্দ্দেশ করেন যেখানে কোন একটী গ্রহ থাকা সম্ভব যাহার আকর্ষণে উরানসের গতির ঐ প্রকার বৈলক্ষণ্য হইতে পারে অনুমান করেন। ঐ সময়ে লা ভেরিয়ার নামে একজন ফরাসি জ্যোতির্ব্বিৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এডামের নির্দ্দিষ্ট স্থানে নেপচুন নামক একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। উহা সূর্য্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং উহাকে সকলে একটী নিশ্চল তারকা বলিয়া জানিত। লা ভেরিয়ার প্রথম আবিষ্কার করেন যে নেপচুন একটী নিশ্চল তারকা নহে উহা একটী গ্রহ যাহা ১৬৫ বৎসরে সূর্য্যকে একবার করিয়া প্রদক্ষিণ করে এবং এই নেপচুনের আকর্ষণের ফলে উরানসের গতির ঐ প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। আকাশে যে সকল নক্ষত্র নিশ্চলভাবে আছে দেখিতে পাই তাহারা গ্রহগণ অপেক্ষা বহুদূরে অবস্থিত। তাহাদের কথা আমরা পরের অধ্যায়ে বলিব।

গণিত শাস্ত্র, দূরবীক্ষণ ও আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে এযাবৎ আমরা ২০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনামা গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছি, এবং ২৫ লক্ষ কোটী মাইল দূরে যে সকল নিশ্চল তারকা আছে তাহারা কি পদার্থে নির্ম্মিত, পৃথিবী হইতে তাহাদের দূরত্ব কত, তাহাদের ওজন কত, তাহারা কোন্ কোন্ মূল পদার্থে নির্ম্মিত এবং আকাশে তাহাদের গতি কিরূপ এই সমস্তই আমরা বলিতে পারি।

অষ্টম অধ্যায়

নক্ষত্র সকল কোন্ কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত ?

আকাশে নক্ষত্র সকল দেখিলে মনে হয় যেন নীল চাঁদোয়ার নিচে অসংখ্য ছোট ছোট ইলেক্ট্রিক্ ল্যাম্প ঝুলান রহিয়াছে। তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে উহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটে আছে তাহা পৃথিবী হইতে এক-আধ কোটী নয় ২৫ লক্ষ কোটী মাইল দূরে আছে। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগুলি ঐ ভয়ঙ্কর দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর অতি নিকটে আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহারা সৌর-জগতের মধ্যেই বাস করে—নক্ষত্রগণ অনেক দূরে সৌর-জগতের বাহিরে।

আমরা পূর্ব্ব কথিত আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রগণ হইতে যে আলোক নির্গত হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে আমাদের দেহ, পৃথিবী ও সূর্য্য যে সকল মূল পরমাণু দ্বারা গঠিত গ্রহ-নক্ষত্রগণও সেই সকল মূল পরমাণু দ্বারা গঠিত। পরমাণু সকল আবার প্রোটন ও ইলেক্ট্রন নামক দুই প্রকার বিদ্যুৎকণা দ্বারা গঠিত। সুতরাং পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ মায় আমাদের দেহ ও আকাশস্থ সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই বিদ্যুৎকণা মাত্র।

আমরা আকাশে নক্ষত্র সকল যেরূপ ঘন ঘন দেখিতে পাই বাস্তবিক উহারা সেরূপ ঘন ঘন নাই। আমরা যত বেশী ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখি ততই নূতন নক্ষত্র সকল আবিষ্কার হয় যাহাদের আমরা সহজ চক্ষে দেখিতে পাই না। আমরা শাদা চক্ষে আকাশে নক্ষত্র

সকলকে যেরূপ ঘন ঘন দেখি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে অনেক নূতন নক্ষত্র দেখা যায় বলিয়া আরও ঘন ঘন দেখায়। পৃথিবী হইতে নক্ষত্র সকল অভাবনীয় দূরে আছে বলিয়া আকাশে উহাদের অত ঘন ঘন দেখায়। অনন্ত আকাশ এত বিস্তৃত যে তাহাতে কোটী কোটী নক্ষত্র থাকা সত্ত্বেও উহাকে খালি বলা যায়। পাঁচ-ছয়টী ধূলিকণা মাত্র রাখিয়া যদি হাবড়া ষ্টেশন হইতে সমস্ত দ্রব্য বাহির করিয়া একেবারে খালি করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আকাশ নক্ষত্রে সকলে যেরূপ ঘনভাবে ভর্ত্তি আছে হাবড়া ষ্টেশনকে তদবস্থায় তাহা অপেক্ষা অধিক ঘনভাবে ধূলি-কণায় ভর্ত্তি বলা যাইতে পারে। আকাশে নক্ষত্র সকল অনবরত প্রবল বেগে ভ্রমণ করিলেও তাহাদের মধ্যে এত স্থান ব্যবধান আছে যে কাহারও সহিত ধাক্কা লাগে না। তাই বলিয়া কোটী কোটী বৎসরের মধ্যে যে কখনও একবার এরূপ হইবে না তাহা কেহ বলিতে পারে না। এরূপ একটা ধাক্কা লাগিলেই এই সৌর-জগৎ আর আমাদের পৃথিবীর যে কি দশা হইবে তাহা কল্পনা করা যায় না।

দুই শত কোটী বৎসর পূর্ব্বে একবার এইরূপ ঘটনা ঘটিবার মত হইয়াছিল। একটা নক্ষত্র ঘুরিতে ঘুরিতে কোথা হইতে আসিয়া সূর্য্যের কাছ দিয়া গিয়াছিল। তখন পৃথিবীর জন্ম হয় নাই। সূর্য্য তখন একটা গরম বাষ্পময় পিণ্ড ছিল। নক্ষত্রটাও ঐ প্রকার—সব নক্ষত্রই প্রায় এক রকম। নক্ষত্রটা যখন সূর্য্যের অতি নিকটে আসিয়াছিল তাহার আকর্ষণে সূর্য্যের খানিকটা বাষ্পময় অংশ (সমুদ্রে যেমন চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হইয়া সমুদ্রের জল ফুলিয়া উঠে সেইরূপ) ফুলিয়া উঠিয়া উহা হইতে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নক্ষত্রটা যেমন চলিয়া যাইতেছিল ঐ টুক্‌রাগুলাও তাহার টানে উহার সঙ্গে সঙ্গে খানিক দূর গিয়াছিল। যখন সে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল তখন তাহার

টানের জোর কমিয়া যায় এদিকে সূর্য্যও ঐসকল টুক্‌রা নিজের দিকে টানিয়া রাখিতে ছাড়ে নাই। সুতরাং তদবধি ঐ সকল টুক্‌রা সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐ সকল টুকরার মধ্যে একটা টুক্‌রা আমাদের পৃথিবী।

নক্ষত্রটা যখন সূর্য্য হইতে দূরে ছিল তখন তাহার টানের জোর বেশী না থাকায় সূর্য্য হইতে ছোট ছোট খণ্ড ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং উহা যত সূর্য্যের নিকটে আসিয়াছিল তত টানের জোর বেশী হওয়ায় বড় বড় খণ্ড ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছিল। পরে যখন উহা সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিল টুক্‌রাগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছিল। টুক্‌রাগুলির আকার যথাক্রমে নিম্নের চিত্রে দেখান হইয়াছে।
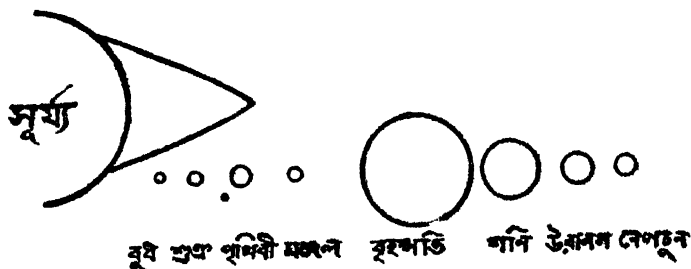
বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল ইহারা পর পর বড় হইয়া বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়াছে, তার পর শনি, উরানিয়স, নেপচুন পর পর ক্রমশঃ ছোট হইয়াছে। ইহাদিগকে সূর্য্যের গ্রহ বলে। এই গ্রহগণের প্রত্যেকের আবার এক বা ততোধিক উপগ্রহ আছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ উপগ্রহ সকল গ্রহগণের অংশ হইতে উৎপন্ন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই-রূপে সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহগণকে লইয়া সৌর-জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। নক্ষত্র-জগতের কথা পরের অধ্যায়ে বলিব।

নবম অধ্যায়

ছায়াপথের বিবরণ

তোমরা রাত্রিকালে আকাশের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাইবে কতকটা আলোকরাশি আকাশের এক দিক হইতে আরম্ভ হইয়া অপর দিক পর্য্যন্ত নদীর ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাকে ছায়াপথ বা মিল্‌কি ওয়ে (Milky Way) বলে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে এই ছায়াপথে অসংখ্য নক্ষত্ররাশি পুঞ্জীভূত হইয়া নদীর মত আকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে। পৃথিবীর যে-কোন স্থানে যাও সেখান হইতে উহাকে দেখিতে পাইবে। উহা যে কেবল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা নহে, সমস্ত সৌর-জগৎকে বেষ্টন করিয়া আছে। পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও গ্রহগণ নয় হইতে বার-তের কোটী মাইল পর্য্যন্ত দূরে আছে। ছায়াপথের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র পৃথিবী হইতে ২৫ লক্ষ কোটী মাইল দূরে আছে। ছায়াপথের কোন কোন নক্ষত্র পৃথিবী হইতে এত দূরে আছে যে যদি অঙ্কপাত দ্বারা দেখাইতে হয় তাহা হইলে কোন এক অঙ্ক লিখিয়া তাহার পৃষ্ঠে শূন্য বসাইতে বসাইতে একখানা ফুলিস্‌কেপ কাগজ শেষ হইয়া যায়। ইহাদের দূরত্ব সংখ্যার দ্বারা উল্লেখ করিতে হইলে মানুষের ভাষায় কুলায় না।

ছায়াপথের ভিতর যে সকল নক্ষত্র আছে তাহারা অত্যন্ত ঘন ঘন দেখাইলেও উহাদের মধ্যে এত বিস্তৃত আকাশ ব্যবধান আছে যে উহারা যদিও ডাক-গাড়ীর অপেক্ষা হাজার গুণ বেগে অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তথাপি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কখন কোন ঠোকাঠুকি হয় না। ছায়া-

পথের প্রকৃত আকার ও আকাশে উহা কি ভাবে আছে তাহার ধারণা করা একটু কঠিন। আমি যত সহজে পারি তোমাদের বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি।

মনে কর একটা প্রকাণ্ড রবারের বেলুন যাহার দুই পিঠ পকেট ঘড়ির মত চেপ্টা ও যাহার উপরকার এক প্রান্ত হইতে নিচেকার অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এত পুরু যে প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলিলে ২ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর লাগে। মনে কর তত বড় একটা বেলুন আকাশে শূন্যমার্গে ভাসিতেছে। ঐ বেলুনের পেটের ভিতর অন্যূন ৩০০ কোটী নক্ষত্র আছে। এই নক্ষত্রগুলির মধ্যে কোনটা বা সূর্য্যের মত কোন কোনটা বা সূর্য্য অপেক্ষা বড়। ছায়াপথটা ঠিক আমাদের এই কাল্পনিক বেলুনের মত আকার বিশিষ্ট। আমাদের কাল্পনিক বেলুনের একটা রবারের খোল আছে কিন্তু ছায়াপথ কোন খোলের মধ্যে নাই। উহা অনন্ত বিস্তৃত আকাশের একস্থানে ৩০০ কোটী নক্ষত্রপুঞ্জের একত্র সমাবেশ। এই ছায়াপথের ভিতর সূর্য্য, একটুস্থান লইয়া পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের সহিত সৌর-জগৎ ফাঁদিয়া বসিয়া আছে। এই সৌর-জগতের মধ্যে অবস্থিত পৃথিবী হইতে ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল দূরে সূর্য্যকে আমরা একটী থালার মত দেখি। ছায়াপথের ভিতরে যে অগণিত নক্ষত্র সকল আছে তাহারা সূর্য্যের মত অথবা সূর্য্য অপেক্ষা বড় হইলেও তাহারা পৃথিবী হইতে এত দূরে আছে যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে তাহাদিগকে একটী উজ্জ্বল বিন্দুমাত্র দেখায়। এইবার বুঝিতে পারিলে ছায়াপথটা কি অচিন্তনীয় বৃহৎ ব্যপার! জ্যোতির্ব্বিদগণ ছায়াপথকে গ্যালেক্‌টিক্ নেবুলি (Galectic nebulæ) বলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ছায়াপথের দুই পিঠ পকেট ঘড়ির মত চেপ্টা। মনে কর একটা পকেট ঘড়ির ভিতরে এক গাদা নক্ষত্র ভরা আছে।

তুমি যদি ঐ ঘড়ির ভিতরের মধ্যস্থ কোন এক স্থান হইতে সোজা ঘড়ির চেপ্টা পিঠের দিকে দৃষ্টিপাত কর অল্প সংখ্যক নক্ষত্র দেখিতে পাইবে এবং হেলানে ভাবে উহার যত উপরে ও নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে তত অধিক সংখ্যক নক্ষত্র দেখিতে পাইবে এবং তাহারা ঘন দেখাইবে। ছায়াপথের নক্ষত্র সকল আকাশের যে অংশে ঐরূপ ঘন দেখায় সেইটাই সাদা ফিতার মত আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখায়। আকাশের অপর অংশে নক্ষত্র সকল পাতলাভাবে থাকায় আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না।

এই বিশাল বেলুনরূপ ছায়াপথের উপরে কোন আবরণ নাই অথচ ইহার ভিতরকার নক্ষত্র সকল একটা গণ্ডির মধ্যে জড় হইয়া থাকে কেন? ইহারা সীমার বাহিরে চলিয়া যায় না কেন? ইহার উত্তর এই,—পূর্ব্বকথিত যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে একটী আপেল ফল গাছ হইতে মাটীতে পড়ে, একটী পরমাণুর মধ্যে পুং-তড়িৎকে বেষ্টন করিয়া স্ত্রী-তড়িৎ সকল ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া গ্রহগণ আকাশে ভ্রমণ করে সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে ছায়াপথের নক্ষত্র সকল পুঞ্জীভূত হইয়া আকাশে অবস্থিতি করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ছায়াপথের আকার ঠিক গোল নহে, পকেট ঘড়ির মত চেপ্টা এরূপ হইবার কারণ এই ভীষণ ছায়াপথটা আস্তে আস্তে লাটিমের মত ঘুরে। ৩০০ কোটী বৎসরে উহার এক পাক হয়। পৃথিবীও ঐরূপ ঘোরে বলিয়া উহার দুই পাশ চাপা। পৃথিবী ছায়াপথের অপেক্ষা অনেক বেশী বেগে ঘুরে; চব্বিশ ঘণ্টায় উহার এক পাক হয়।

অপর পৃষ্ঠার ছায়াপথের যে চিত্রটী দেওয়া হইল উহা লক্ষ্য করিলে দেখিবে নক্ষত্র সকল যেন একস্থানে খুব ঘন হইয়া রহিয়াছে (১নং চিত্র দেখ)। পূর্ব্বে বলিয়াছি উহারা ডাক গাড়ির বেগের অপেক্ষা হাজার গুণ

১নং চিত্র
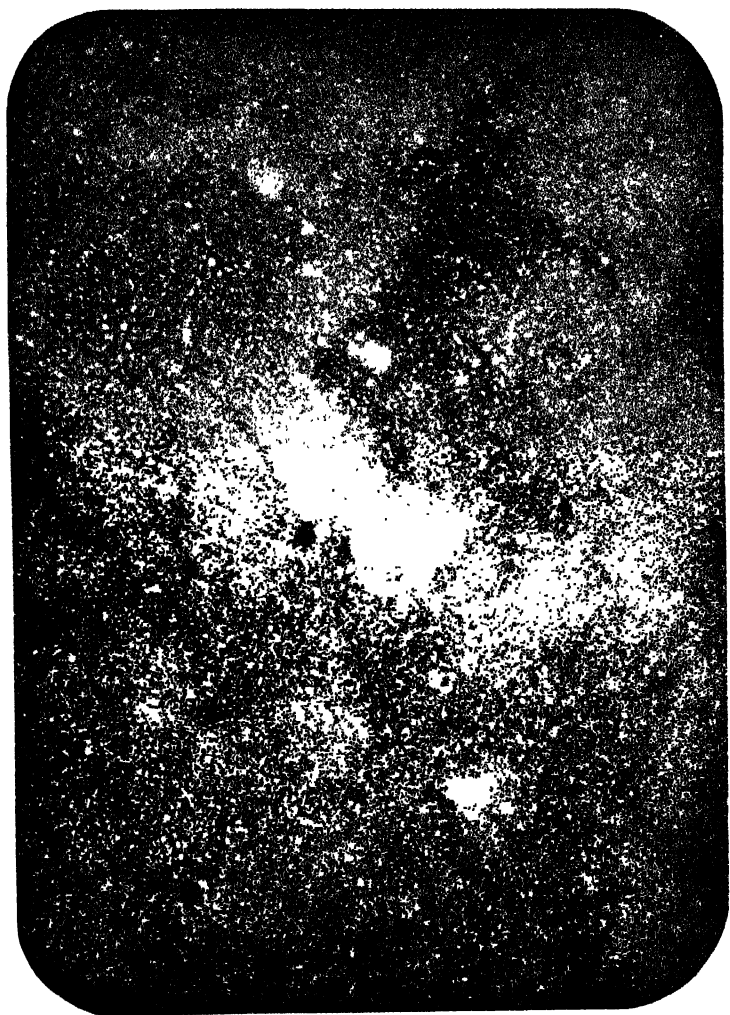
দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে ছায়াপথের একাংশ যেরূপ দেখায়

বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাইল আকাশ ব্যবধান আছে। এ কারণে উহাদের একটার সহিত আর একটার কখন ঠোকাঠুকি লাগে না। যদি কখন ঠোকাঠুকি হয় জগতে বিপর্য্যয় প্রলয় উপস্থিত হইবে।

দশম অধ্যায়

নক্ষত্রগণের জন্ম-কথা

ছায়াপথের নক্ষত্র সকল পৃথিবী হইতে কিরূপ অচিন্তনীয় দূরে আছে বলিয়াছি। এখন আবার তাহা হইতে আরও দূরে অনন্তর দিকে তোমাদের লইয়া যাই চলো। এতক্ষণ যে নক্ষত্র সকলের কথা বলিলাম তাহারা ছায়াপথের ভিতরে। এখন যে রাজ্যে তোমাদের লইয়া যাইতেছি তাহা ছায়াপথের বাহিরে আরও দূরে, সেখানে নক্ষত্রের ভিয়ান চড়িয়াছে। ঈশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়মরূপ হালুইকর নক্ষত্র সকল ভিয়ান করিতেছে। মেঘের মত খানিকটা করিয়া উজ্জ্বল গ্যাস আকাশের স্থানে স্থানে একত্র হইয়া বীজ হইতে যেমন ক্রমে ক্রমে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয় সেইরূপ তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে নক্ষত্র সকল উৎপন্ন হইতেছে। এই মেঘের মত উজ্জ্বল গ্যাসকে নীহারিকা বা নেবুলা (Nebulæ) বলে।

অনন্ত আকাশে পৃথিবী হইতে অনেক দূরে ছায়াপথ ছাড়িয়া আরও দূরে যে রাজ্যের কথা বলিলাম তাহাকে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নীহারিকাময় প্রদেশ (Extra galectic nebulæ) বলেন। এই রাজ্যের স্থানে স্থানে খানিকটা করিয়া উজ্জ্বল গ্যাস পুঞ্জীভূত হইয়া মেঘের মত হইয়া আছে। ঐ নীহারিকা মেঘ সকল আমরা যে বিরানব্বইটী মূল পরমাণুর কথা বলিয়াছি তাহাদেরই আদি বাষ্পীয় অবস্থা। বাষ্প শীতল হইলে জল হয় তাহা জলের বাষ্পীয় অবস্থা। নেবুলা সকল যে আদি পরমাণু হইতে জলের ও অন্যান্য পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদেরই আদি বাষ্পীয় অবস্থা। আমরা দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়াছি

২নং চিত্র
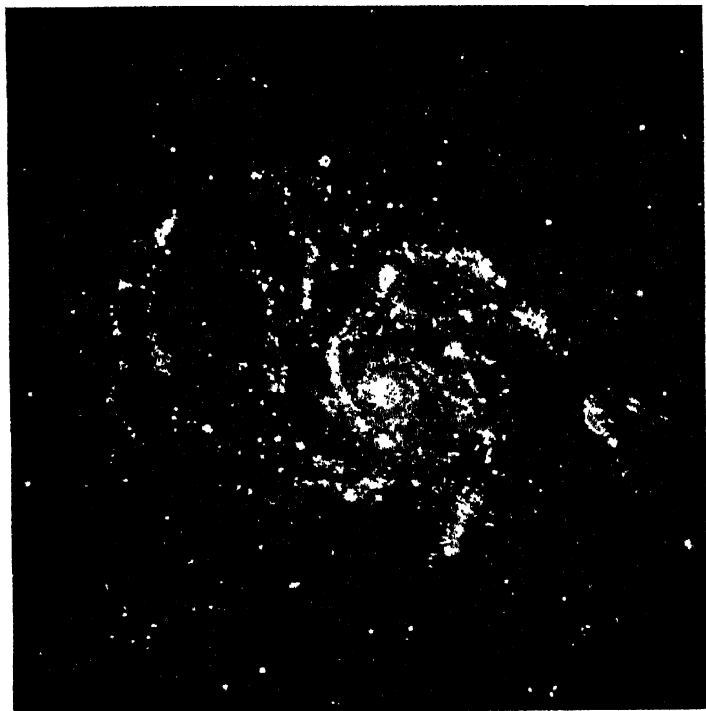
চরকি বাজিতে আগুন দিলে যেরূপ দেখায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে কোন একটী নীহারিকা সেইরূপ দেখাইতেছে

৩৯ পৃঃ

নেবুলা রাজ্যে টুক্‌রা টুক্‌রা মেঘের মত কিছু না হউক অন্যূন কুড়ি লক্ষ নেবুলা আছে।

আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে যায়। এইরূপ বেগে সাড়ে-চার বৎসর ধরিয়া অনবরত চলিলে যত মাইল যাওয়া যায় তাহাকে এক আলোক-মাইল বলে। একটা নেবুলা হইতে অপর একটা নেবুলা ২০ লক্ষ আলোক-মাইল। একটা নেবুলার ওজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ ও অঙ্ক-শাস্ত্রে পণ্ডিত জিনস্‌ সাহেব হিসাব করিয়া বলিয়াছেন সূর্য্যের ৩৫০ কোটী গুণ। নক্ষত্র সকল আদিতে এই প্রকার নেবুলা সকল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। নেবুলা সকল এক একটা প্রকাণ্ড গ্যাসের পিণ্ড। আমাদের সৌর-জগৎ এই প্রকার একটা প্রকাণ্ড নেবুলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক একটা নেবুলাতে ২০০ কোটী নক্ষত্র তৈয়ার হইবার মত পদার্থ আছে। কতকগুলা নেবুলা নক্ষত্র তৈয়ার করিবার মত হইতেছে আর কতকগুলা এখনও নক্ষত্র তৈয়ার করিবার মত হয় নাই। লাটিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে ইহাদের হইতে খানিকটা করিয়া গ্যাসের ডেলা, চর্কি বাজিতে আগুন দিলে যেমন তাহা হইতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছট্‌কাইয়া বাহির হয় সেইরূপ ছট্‌কাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এই সকল গ্যাসের ডেলাই নক্ষত্র রূপে পরিণত হইতেছে। (২নং চিত্র দেখ)। ছায়াপথটা এইরূপ একটা অতি বৃহৎ নেবুলা বা নীহারিকা হইতে উৎপন্ন। যদি কখন আমাদের এই সৌর-জগৎ ধ্বংস হইয়া পুনরায় নেবুলা রূপে পরিণত হয়, এখন যে সকল নেবুলা দেখা যাইতেছে ততদিনে হয়তো তাহাদের মধ্যে কোনটা হইতে নক্ষত্র সকল উৎপন্ন হইয়া নূতন সৌর-জগৎ সৃষ্ট হইবে।

ছায়াপথের সহিত নেবুলা রাজ্যের নেবুলা সকলের গতি ও অবস্থানের সাদৃশ্য দেখা যায়। ছায়াপথ যেমন লাটিমের মত ঘুরিতেছে নেবুলা সকল

সেইরূপ ঘুরিতেছে। উহাদের এক এক পাক দিতে প্রায় দুই কোটী বৎসর লাগে। ইহাদের আকার এত বড় যে ইহারা প্রতি সেকেণ্ডে একশো মাইল বেগে ঘুরিলেও বোধ হইবে যেন মোটেই ঘুরিতেছে না।

তোমরা স্মরণ রাখিও দু'শো কোটী বৎসর হইল পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে। তিন লক্ষ বৎসর হইল পৃথিবীতে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনশো বৎসর হইল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবনা হইয়াছে। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন হওয়ার পর আমরা নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে এমন অনেক বিষয় জানিয়াছি যাহা কেহ পূর্ব্বে জানিত না, আমরা তাহাদের গতিবিধি সকল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি। আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রের (Spectroscope) উদ্ভাবন করিয়া উহারা কোন্ কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত তাহা জানিতে পারিয়াছি। উহারা কত বড় এবং পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। উহাদের সম্বন্ধে গত এক হাজার বৎসরের মধ্যে যাহা জানিতাম এই তিনশো বৎসরে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানিতে পারিয়াছি। আমরা আশাকরি আর একশো বৎসর পরে উহাদের সম্বন্ধে আরও অনেক বেশী জানিতে পারিব যাহা এখন আমরা কল্পনা করিতে পারিতেছি না।

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ৸৹ আনা ডাকমাশুল ৵৹ আনা

এই পুস্তকে হক্সলি, হেকেল, সার অলিভার লজ, সার এ কিথ, সার জে জীন্‌স, বারট্রাণ্ড রসেল, এইচ জি ওয়েলস্ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের ও ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণের জগৎ সৃষ্টি, ঈশ্বর, পরমাত্মা ও জীবাত্মা ও মানবের জন্ম সম্বন্ধে মত সকল আলোচিত হইয়াছে এবং মানবের ইতিহাস ও পরিশিষ্টে পরমাণুর গঠন কি প্রকার ও রামন্ রশ্মির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তক সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকলের প্রকাশিত সমালোচনার মধ্যে নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত হইল।

LIBERTY

In this din and bustle of modern life very few of us get any opportunity of pondering over the mystery of existence and the source of life that is to say, about the universe and creation. Most of us have only some vague ideas or go about with theories propounded in magazine articles, and they are confusing, indeed. Of course, it is not easy to come to any definite conclusion. Apart from the ancint theories held by Hindu books of philosophy, modern science has so far failed to come to any definite conclusion about the cosmos, nay, about life and matter. Still the discoveries of science are startling, and they

are being continued, perhaps to yield conclusive results. But curiously in our country very few are posted with the latest scientific theories about these subjects, and in that respect the author has done a distinct service by giving the Bengali reading public an opportunity to get scientific views of creation, soul and God. It is not sugge-sted that the scientific view is correct or final, for science is constantly shifting ground and is still engaged with working hypothesis, but certainby it is profitable to put the age-long, rather dogmatic, theories to the crucial test of scientific standard.

The author has given in lucid language, in brief compass the explanations offered by modern science to those baffling problems. But what readers will find more interesting are the last three essays, nmely, the history of mankind, the structure of the atoms, and lastly Raman Ray, recently discovered by Sir C. V. Raman. These are, we think, far more instructive to people in general than those abstract and abstruse subjects like soul or supersoul, which perhaps none but real Yogis can comprehend or explain. However, every essay (these were formerly published in a magazine at different times) bears marks of vast erudition, spirit of research and depth of thought of the author, and we congratulate him on adding a valuable book at a low price to the series contributed by Bengali philosophers, in vernacular.

পুষ্পপাত্র—ফাল্গুন, ১৩৩৮ সাল

জগৎ সৃষ্টি ও তাহার কার্য্য সমুদায় বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে বিভিন্নরূপে উল্লিখিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান এ যুগের মানুষের চিন্তাধারাকে একটী নূতন পথে পরিচালিত করিয়াছে যাহার ফলে মধ্য যুগের অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তি আজ শিথিল। বৈজ্ঞানিকগণ বহু কঠিন গবেষণা, পর্য্যবেক্ষণ ও নানা পরীক্ষা দ্বারা জাগতিক ব্যাপারের যে নব নব সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছেন গ্রন্থকার সে গুলিকে শিক্ষিত সাধারণের উপযোগী করিয়া গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিষয়গুলি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই জানা দরকার, বিশেষ করিয়া মানবজাতির ইতিহাসটি। কিন্তু নানা বিষয়; তাহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থও নানা প্রকার। সেগুলি পাঠ করার সুযোগ ও সুবিধা সকলের থাকা সম্ভবও নয়। অথচ এ সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত ভাসা ভাসা। পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় এমন একখানিও গ্রন্থ ছিল না, যাহা হইতে এই সকল বিষয় জানা যায়। কিন্তু এই গ্রন্থখানির দ্বারা সে অভাব পূরণ হইল। বিষয়গুলি জটিল—লিখিবার গুণে অতি সহজ হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

AMRITA BAZAR PATRICA

Amid the plethora of works of fiction in Bengali here is a treatise where the author, a septuagenerian Zemindar, has struck an altogether original line of his own and deals with such abstruse subjects as the Genesis, God, the Universal and the Individual Soul, the evolution of mankind, atomic structure and Raman Rays from the scientific or rationalistic standpoint. In his preface, the author points out that India has been the home of free thinking from time immemorial and hence he takes no

pains to reconcile what may be termed ancient loyalties with modern scientific beliefs. And yet, as he observes, the conception of Godhead from the point of view of science as the True, the Benignant and the Beautiful ('Satyam,' 'Shivam,' and 'Sundram') is not materially different from that of the Upanishads. Altogether it is a stimulating and thought-provoking theme, even though the author's treatment may not find general acceptance on all points. The book is illustrated with some diagrams explaining the evolution of man from the biological standpoint and has been dedicated to Sir P. C. Roy, a close comrade of the author in his early life.

ভট্টাচার্য্য-পরিবার

(সচিত্র গার্হস্থ উপন্যাস)

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তক বলিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। মূল্য ১৷০

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদপত্র ও বিদ্বান্‌-মণ্ডলীর মতামত—

মাননীয় জষ্টিস্ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডি, এল্ মহাশয় "ভট্টাচার্য্য পরিবার" পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন :—

আপনার প্রদত্ত "ভট্টাচার্য্য পরিবার" নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ ও যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি।

পুস্তকখানি যদিও গোল্ডস্মিথের Vicar of Wakefield নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত, অনুবাদ বা অনুকরণে যে সকল দোষ প্রায়ই থাকে, তাহার কিছুই ইহাতে দেখা যায় না। বিদেশীয় উপন্যাস ও তাহার ঘটনা-সমূহ এবং বিজাতীয় চরিত্র ও ভাবগুলি এমন সুন্দররূপে বর্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছে যে, তৎসমুদয় যে আমাদের স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বিষয় নহে, এ কথা কেহ সহসা বলিতে পারেন না। সত্য বটে, আপনার পুস্তকের এইগুলি মূল গ্রন্থের চরিত্র ও ভাবগুলির সার্ব্বভৌমিকতার উপর কিয়ৎ-পরিমাণে নির্ভর করিতেছে; কিন্তু মূলের প্রাপ্য প্রশংসার ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে বাদ দিলেও আপনার অনুবাদের প্রাপ্যাংশ কোন ক্রমেই কম হইবে না। এই পুস্তক প্রণয়নে আপনি যথেষ্ট রচনাকৌশল দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে ইহা একটি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন:—

সুলেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই 'ভট্টাচার্য্য-পরিবার' উপন্যাসখানি পড়িয়াছিলাম অনেকদিন পূর্ব্বে—১৯০৩ অব্দে। এখনও কিন্তু বইখানির কথা মনে আছে। প্রথম সংস্করণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফুরাইয়া গিয়াছিল, আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। এতদিন পরে গ্রন্থকার মহাশয় উপন্যাসখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতেছেন শুনিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। সেই আনন্দ প্রকাশের জন্যই বহুপূর্ব্বে অধীত বইখানি শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুর অনুগ্রহে আর একবার এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম। আমার ত মনে হয়, অক্ষয় বাবু যদি ভূমিকায় না বলিয়া দিতেন তাহা হইলে অনেক ইংরেজীনবীশও ধরিতে পারিতেন না যে এখানি Vicar of Wakefieldর ছায়া লইয়া লিখিত। ইহা উক্ত পুস্তকের অনুবাদ যে নহে, তাহা পুস্তকখানির দশ লাইন পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়—ভাষা এমন সুন্দর, এমন সরল; বর্ণনা এমন

মনোরম ; আর ঘটনা-সংস্থানেও গ্রন্থকারের কৃতিত্ব আছে, যদিও তিনি Vicar of Wakefield হইতে অনুপ্রাণনা পাইয়াছেন। প্রবীণ লেখক মহাশয় 'ভট্টাচার্য্য-পরিবারে'র দ্বিতীয় সংস্করণ এতকাল পরে ছাপাইয়াই সাহিত্যের দরবার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন, এ কথা যেন না ভাবেন ; তাঁহার ন্যায় কৃতী লেখকের নিকট বাঙ্গালী পাঠক অনেক আশা করেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ } শ্রীজলধর সেন

বঙ্গসাহিত্যানুরাগ হেতু জুবিলী-সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত, কলিকাতা পুলিস কোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল, স্বর্গীয় কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন :—

"Yours is a neatly got up and pretty book. The outward beauty however is nothing compared to its intrinsic worth. The profuseness of the references to our customs and practices and the manner in which they are intertwined with the main story are illustrative of your power of observation. Book like this of easy reading do inmense good to society by the popularity they create,'

হাতরা পবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান লিখিয়াছেন :—

"I am directed by the members of the above library to say that the tenor of your writing has thoroughly preserved the spirit of the original with such necessary modifications as have rendered it quite in harmony with the tastes and ideas of the Hindus in general. The work is a success and deserves encouragement from the public.

বঙ্গবাসী

ভট্টাচার্য্য-পরিবার। (উপন্যাস) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার লিখিতেছেন,—"পুস্তকখানি গোল্‌ডস্মিথ সাহেব কৃত প্রসিদ্ধ "Vicar of Wakefield" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।" অবলম্বন অবশ্য উপাখ্যানে, গঠনে গ্রন্থকার বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিলাতে বয়স্থা অনূঢ়ার পরপুরুষের সহিত প্রেম-সংঘটন অসম্ভব নহে; অক্ষয় বাবু আপন গ্রন্থে একটি ভট্টাচার্য্য-পরিবারে সেই প্রেম সংঘটনের প্রয়াস পাইতে গিয়া ভট্টাচার্য্যের একটী অনূঢ়া কন্যাকে যৌবনের প্রাগ-বিভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখানেই পর্য্যবসান নহে, শেষে সে কন্যা একটী পরপুরুষের প্রেমানুরাগে পলায়নপরা। আর একটি কন্যার কৈশোরেই প্রেমের পূর্ব্বরাগ উদ্ভাসিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য-পরিবারের ভাষা বেশ সরল ও সহজ। গার্হস্থ্য চিত্রাঙ্কণের ও স্বভাব-বর্ণনের কৃতিত্বের পরিচয় পাই। গল্পটিও কৌতূহলোদ্দীপক। 12th Dec., 1903.

বসুমতী

ভট্টাচার্য্য-পরিবার। শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। পুস্তকখানি গোল্ডস্মিত সাহেব কৃত প্রসিদ্ধ Vicar of Wakefield নামক গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত; গোল্ড-স্মিথ সাহেবের পুস্তকখানি যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহারাই পাঠ করিয়াছেন; অক্ষয় বাবু এই সুন্দর পুস্তকের ভাব লইয়া ভট্টাচার্য্য পরিবার লিখিয়া ভালই করিয়াছেন। ইহাকে কেহ অনুবাদ মনে করিবেন না; পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের উপাখ্যানের বিষয় বজায় রাখিয়া এবং আমাদের সামাজিক আচার

ব্যবহারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পুস্তকখানি লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। লেখক এ কার্য্যে নূতন ব্রতি হইলেও তাঁহার নিরাশার কোন কারণ দেখিলাম না, পুস্তকখানি সুলিখিত হইয়াছে। 23th. Jan., 1924.

হিতবাদী

৪। **ভট্টাচার্য্য-পরিবার**—উপন্যাস, শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। অলিভার গোল্ডস্মিথ যদি জানিতেন যে, তাঁহার পুস্তক বঙ্গদেশে ভাষান্তরিত হইবে, তাহা হইলে তাঁহার ভিকার অন্যমূর্ত্তি ধারণ করিত। অনুবাদ করা সহজ কার্য্য নহে, বিশেষতঃ রীতি, নীতি ও সামাজিক ব্যাপার যেখানে সম্পূর্ণ পৃথক, সেরূপ স্থলে এক ভাষার উপন্যাস অন্য ভাষায় বিন্যস্ত করা অতীব আয়াস-সাধ্য। এই সকল বিবেচনা করিলে অক্ষয় বাবুর অধ্যবসায়ের প্রশংসা সকলকে করিতে হইবে। পুস্তকখানি সুন্দরভাবে মুদ্রিত, চিত্রগুলিও মনোহর হইয়াছে। 12th. Feb., 1904.